গণশিক্ষা কার্যক্রম ॥ আশা ও আলোর হাতছানি

তারিখ 27 FEB 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

মোঃ রফিকুল ইসলাম

মানব জীবনে নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য দু'টি অভিশাপ। উভয়ের অবস্থান পাশাপাশি। এই পাশাপাশি অবস্থানের কারণেই আমাদের দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠী নাজুক জীবন যাপন করছে। সীমান্তবর্তী জেলা চুয়াডাঙ্গাও এর ব্যতিক্রম নয়। এই জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছিলেন নিরক্ষর এবং সে কারণে অনিবার্যভাবেই অনগ্রসর। বিষয়টি এলাকার সামাজিক নেতৃবৃন্দকে ভাবিত করে। এই প্রেক্ষাপটে ৯ জুলাই '৯৫ তারিখে জেলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে একটি সভায় মিলিত হন। এখানকার বাস্তবতার আলোকে সেই সভায় সিদ্ধান্তক্রমেই প্রণয়ন করা হয় গণশিক্ষা নির্ভর একটি সমন্বিত কর্মসূচী যার নাম দেয়া হয় "আলোকিত চুয়াডাঙ্গা"। এই কর্মসূচীতে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবেশ সংরক্ষণ প্রভৃতি জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়সহ আত্মকর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রমের লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জেলার সকল স্তর ও পেশার লোকজনকে কর্মসূচীতে সম্পৃক্ত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। এই বাস্তবতা ও সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের একটি ছোট্ট কর্মক্ষেত্র আলোকিত চুয়াডাঙ্গা, যেখানে সাক্ষর-নিরক্ষরের মধ্যবর্তী বিভেদ প্রাচীর সরিয়ে সমাজের সকল অংশকে উন্নয়নের একই গতিধারায় সম্পৃক্ত করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

জুলাই '৯৬-এ কর্মসূচীর গণশিক্ষা কার্যক্রমের প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হয়। প্রথম পর্যায়ে প্রায় চুয়াল্লিশ হাজার নিরক্ষর নারী-পুরুষ সাক্ষর হয়েছেন। অবশিষ্ট নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর করার লক্ষ্যে পরিচালিত দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রমও সমাপ্তির পথে। উল্লেখ্য, জেলার ১১-৪৫ বছর পর্যন্ত বয়সী প্রায় দুই লাখ বিশ হাজার নিরক্ষর নারী-পুরুষ ছিল আমাদের এই কর্মসূচীর কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠী (টার্গেট গ্রুপ)। আজ দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা চূড়ান্ত মূল্যায়নের (পরীক্ষা) মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সাক্ষর হবেন বলে আশা করা যায়। দিনটি নিঃসন্দেহে চুয়াডাঙ্গা জেলার জন্যে তাৎপর্যবহ।

আলোকিত চুয়াডাঙ্গা

পাঠরত মহিলা শিক্ষার্থী।

করার লক্ষ্যে আলোকিত চুয়াডাঙ্গা কর্মসূচীকে একটি সমিতিতে রূপান্তরিত করা হয়। সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমিতির সদস্যপদ গ্রহণে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ অনুমতি প্রদান করে। এই সমিতির আওতায় জেলা, থানা, পৌরসভা/ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে কর্মসূচীর গণশিক্ষার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় উদ্যোগে সূচিত এই কর্মসূচী সরকারের সদয় দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সমর্থ হলে পরবর্তীতে তা সরকারের সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএম) প্রকল্পের আওতাভুক্ত হয়। সরকারী অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে গণশিক্ষা কার্যক্রম।

বর্তমানে শিক্ষা সম্প্রসারণের সুযোগ আমাদের গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করা প্রয়োজন। এদেশে শিক্ষার ইতিহাস পানে তাকালে দেখা যায় যে, সমাজ সভ্যতার ক্রমবিকাশের প্রধান বাহন শিক্ষা কখনই 'সর্বজনীন অধিকার' হিসাবে যথাযথ অর্থে প্রতিষ্ঠা পায়নি। বরাবরই শিক্ষা থেকে গেছে "সুযোগ" হিসাবে, যার দখলদারিত্বে ছিলেন মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবান। বৈদিক যুগ থেকে নিকট অতীত পর্যন্ত এই বাস্তবতায় কোন গুণগত পরিবর্তন লক্ষণীয়ভাবে সাধিত হয়নি। বাস্তবিক অর্থে "রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে, শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে"– এই বক্তব্যের রাখালেরা চিরকালই গরুর পাল নিয়ে মাঠে থেকেছে আর সৌভাগ্যবানদের সন্তানরা নিমগ্ন থেকেছে নিজ নিজ পাঠে। আজ রাখালদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে আমাদের প্রতিশ্রুতি থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক আরোপিত একটি শিক্ষা পদ্ধতি– যেটা তারা নিজেদের প্রয়োজনেই প্রবর্তন করেছিল। এই শিক্ষা মানুষকে যতটা শিক্ষিত করেছে তারচেয়ে বেশি করেছে স্বার্থপর ও পরনির্ভর। যে কারণে এই শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অবদান উল্লেখযোগ্য নয় বরং তা একই সমাজভুক্ত শিক্ষিত-অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি করেছে অনতিক্রম্য প্রাচীর, সমাজদেহ বাঁধা পড়েছে কঠিন অচলায়তনের গণ্ডিতে।

কিন্তু এখন সময় এসেছে এই অচলায়তন ভেঙে ফেলার, সাক্ষর-নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মাঝখানে বিদ্যমান দেয়াল সরিয়ে সকল জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতার ক্বাতারভুক্ত করে সমাজ তথা দেশটিকে সুষম অগ্রযাত্রায় শামিল করার। এই তাগিদ গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে সমাজের সকল স্তরে। সরকার শিক্ষাকে সর্বজনীন অধিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার ডাক দিয়েছে। আসলে সমাজের সকল অংশের গতিশীলতার মধ্যে সমন্বয় স্থাপন এখন অপরিহার্য। সমাজের এক বিশাল অংশকে অবহেলিত রেখে কোনক্রমেই কাঙ্ক্ষিত শিশুকে শিক্ষার সাথে পরিচয় করানোর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন পিতা, মাতা ও গুরুজন। তেমনি শিক্ষা সুযোগ থেকে বাদ পড়া কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে সমাজ। শিশু শিক্ষার জন্য যেভাবে পারিবারিক শাসন ও সোহাগ প্রয়োজন বয়স্ক শিক্ষার্থীদের তেমনই প্রয়োজন সামাজিক শাসন ও সোহাগ। যে পাড়া বা মহল্লায় সামাজিক শাসন যত আন্তরিক হবে সেখানে বয়স্ক শিক্ষা তত বেশি সার্থক হবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল শ্রেণীর মানুষের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা নিয়ে সূচিত এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারের প্রচেষ্টার পাশাপাশি সহায়ক শক্তি হিসাবে জেলার সর্বশ্রেণীর মানুষ-- যথা, ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত যুবক, গৃহবধূ, রাজনৈতিক-সামাজিক নেতৃবৃন্দসহ কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। এছাড়াও জেলায় কর্মরত সকল সরকারী/বেসরকারী সংস্থা এই কার্যক্রমে ইতিবাচক অবদান রেখেছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরের দিক নির্দেশনা ও তদারকি কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া গতিশীল করেছে। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসই কর্মসূচীটিকে সফল সমাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। আমরা কর্মসূচীর শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি।

কার্যক্ষেত্রে নেমে প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছি যুগ-যুগান্তব্যাপী বিরাজমান নিরক্ষরতার এই অন্ধকার ভেদ করা কোন সহজ কাজ ছিল না। কর্মসূচীর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় গ্রাম-পাড়া ও মহল্লাবাসীদের কাছ থেকে কর্মীরা পান আনন্দঘন অভ্যর্থনা ও উৎসাহ। আবার একই সমাজে কারও কারও তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণও কর্মীদের ভাগ্যে জোটে। কিন্তু বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আন্তরিক অভ্যর্থনার উচ্ছ্বাসে ভুলে যান কর্মীরা অশুভ আচরণকে। গণশিক্ষা কেন্দ্রে মায়ের কোলে দুধের শিশু যখন চুলছে কিংবা শিশুকে বুকে নিয়ে মা যখন অন্যদের সাথে সুর মিলিয়ে পড়ছেন এমন সব পবিত্র দৃশ্য কর্মীদের করে আবেগাপ্লুত। উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের ভাবনায় আলোকিত চুয়াডাঙ্গার মূল্যায়ন যাই হোক না কেন, আশা ও আলোর হাতছানিতে মাটির প্রদীপের ন্যায় সীমিত সাধ্য নিয়েই আমরা ব্রতী হয়েছিলাম বিশাল অন্ধকার অপসারণে। যে ভাষাকে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করার জন্য এদেশের মহান শহীদেরা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন, সে ভাষার অক্ষরগুলোকে নিরক্ষর মানুষের কাছে পরিচয় করিয়ে, চলমান অগ্রযাত্রায় তাঁদের শামিল করে নিতে আমরা আমাদের কার্যক্রম শুরু করেছিলাম। আমাদের বিশ্বাস এ যাত্রার ধারাবাহিকতা একদিন এই অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করবে। সরকার ও সমাজ সেদিন হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলবে কাঙ্ক্ষিত সাফল্যে।